চিত্রকলায় প্রকৃতি

প্রশান্ত দাঁ

(প্রখ্যাত অঙ্কনচিত্র বিশেষজ্ঞ ও এই বিষয়ক গবেষক)

সুদূর অতীতে একদা মানুষ বন কেটে বসত বানিয়েছিল। ক্রমান্বয়ে তার বিস্তার কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত হয়ে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। অরণ্যের অভাবে এখন জলবায়ুর ভারসাম্য হারিয়ে প্রকৃতিতে নানা বিপর্যয় শুরু হয়েছে। তাই প্রতিবছর সারা বিশ্বজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হয় 'সবুজায়ন প্রকল্প', 'অরণ্য দিবস', 'বৃক্ষরোপন উৎসব' প্রভৃতি। আধুনিক সভ্যতার মানুষ কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে— 'দাও ফিরে সে অরণ্য', লও এ নগর'।

এই অরণ্য থেকেই সূচনা হয়েছিল মানব সভ্যতা ও তার জয়যাত্রার। খ্রিস্ট জন্মের প্রায় পাঁচ থেকে বিশ হাজার বছর পূর্বের সময়কে ইতিহাসবিদরা 'প্যালেওলিথিক' বা 'পুরোপলীয়' যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রধানত এই সময় থেকেই অরণ্য সন্নিবিষ্ট গুহা, গিরিকন্দরে বসবাসকারী আদিম মানুষেরা গুহাগাত্রে এঁকেছেন প্রধানতঃ জীবজন্তু, শিকার ও শিকারীকে কেন্দ্র করে বিচিত্রসব ছবি রৈখিক বিন্যাসে হালকা মেটে ও কালো রঙের ছোপে। এইরকম কিছু নির্দশন ছড়িয়ে আছে আফ্রিকা, স্পেন, মালয়, জাভা, জাপান প্রভৃতি দেশের গুহা অভ্যন্তরে। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম এই ধরণের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় বিন্ধ্যপর্বতমালার একটি গুহায়। ছ'টি মানুষ একত্রিত হয়ে একটি গণ্ডারকে আক্রমণ করছে। এসব তাদের জীবনের বাস্তব ঘটনা। কারণ তখন শিকারই ছিল মানুষের খাদ্য সংগ্রহের একমাত্র উপায়। এ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের রায়গড় জেলার সিংহনপুর ও মহাদেব পর্বতের গুহার ভেতরেও এই ধরণের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে অরণ্যবেষ্টিত গুহাতেই ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল এবং বিষয় ছিল মূলত অরণ্যের জীবজন্তু ও শিকার। কালের ক্রমবিবর্তনে মানুষ ক্রমশ সভ্য ও শিক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অরণ্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। এখনওতো দৈননন্দিন জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ বারবার ফিরে যান অরণ্যের কোলে, সাময়িক স্বস্তি পাবার আশায়। শুধু সাধারণ

মানুষ নয়, শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র এবং সৃজনের নানা মাধ্যমে অরণ্যের দিনরাত্রি, তার জীবন যৌবন প্রাণিত হয়ে উঠতে দেখা যায় যুগ যুগান্তকাল ধরে।

যুগন্ধর শিল্পী লিওনারদ দ্য ভিঞ্চি বলতেন, 'যদি কোথাও যেতেই হয় তো যাও প্রকৃতির কাছে। তিনিই হোন তোমার প্রকৃত অধিশ্বরী।' মনে হয় তিনি অরণ্যের মতো মুক্ত, উদাত্ত প্রকৃতির কথাই বলেছেন। এই ভাবনারই প্রতিভাস পরিলক্ষিত হয় প্রাচ্য প্রতীচ্যের বেশ কিছু শিল্পীর রূপকল্পনায়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে হেনরি রুশো-র (১৮৪৪-১৯১০) চিত্রকলা। তাঁর আঁকা অবয়বিক ছবিগুলোতে স্তুতিচ্ছলে একটা শ্লেষ পরিহাস থাকওেল নিসর্গ চিত্রগুলোতে ছলাকলাশূন্য, সাদাসিধে শিশুসুলভ ভাব ঐশ্বর্যে ভরপুর। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মেক্সিকোর বন জঙ্গল এবং প্যারিসের বোটনিক্যাল গার্ডেন। ঘন বন জঙ্গল এবং তার কোলে আশ্রিত জীবজন্তু বাস্তব-কল্পনায় সমন্বিত হয়ে এক অপরূপ সারল্য-সৌন্দর্যে জীবন্ত হয়েছে ছবিতে। বিভিন্ন রকমের ফল, ফুল, লতাপাতা, জীবজন্তু আকীর্ণ ছবিগুলো বেশিরভাগই আঁকা হয়েছে গ্রীষ্মকালে। এমনকি মানুষ বা প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছবিতেও পটের বেশিরভাগ জমি জুড়ে শোভা পাচ্ছে অরণ্যের মতো ঘন সবুজ বিচিত্র সব গাছগাছালি। এ প্রসঙ্গে 'দ্য স্নেক চারসাম (১৯০৭), 'দ্য ফুটবল প্লেয়ার' (১৯০৮), 'দ্য ড্রিম' (১৯১০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ ল্যান্ডস্কেপ পেন্টারদের মধ্যে সবেচেয়ে উজ্জ্বল হলেন রিচার্ড উইলসন (১৭০১৩-১৭৮২)। তাঁর নিসর্গ চিত্রে গভীর অরণ্যের দৃশ্যকল্প না থাকলেও ইংল্যান্ড, ইটালী এবং রোমের শহতলীর যে সব অনবদ্য শান্ত প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছবির পটে দু একটি স্থাপত্য বা মানুষের উপস্থিতি থাকলেও নব্বই ভাগ জমি জুড়ে উদাত্ত অনাবিল বন্য প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে মোলোড্রামাটিক ছবি আঁকলেও পরবর্তীকালে নিসর্গের চিত্রকর হিসেবেই তিনি কুখ্যাত। তাঁর আঁকা বিখ্যাত কয়েকটি ছবি হল 'রোম ফরম দ্য ভিলা মাডামা' (১৭৫৩), 'দ্য হোয়াইট মনক' (১৭৬০-৬২), 'সোলিটিউড' (১৭৬২), 'লিডফোর্ড ওয়াটারফল, টাভিস্টক' (১৭৭১-৭২) প্রভৃতি। বৃটিশ নিসর্গ চিত্রকরদের তালিকায় আর এক ফরাসি শিল্পী হলেন জন কনস্টেবল (১৭৭৬-১৮৩৭)। এঁনার রূপকল্পনায় প্রধানত প্রাঞ্জল হয়েছে লন্ডন শহর এবং তার আশপাশের প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য। বিস্তৃত চিরসবুজ প্রকৃতির কোলে ছোটখাটো জলাশয়, স্থাপত্য, মানুষ, জীবজন্তু নিয়েই নির্মিত হয়েছে চিত্রকল্প। প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায় আকীর্ণ চিত্রাবলীর মধ্যে 'বোটবিল্ডিং' (১৮১৫), 'দ্য হে ওয়েন' (১৮২১), 'স্টোনহেঞ্জ' (১৮৩৬), 'দ্য কর্নফিল্ড' (১৮২৬) প্রভৃতি ছবির কথা চিত্ররসিকদের স্মৃতিতে ভেসে উঠবে বলে মনে হয়। 'কর্নফিল্ড' শব্দটি উচ্চারিত হলে ভিন্টসেন্ট ডানগাখ-এর (১৮৫৩-১৮৯০) হলুদ বর্ণের প্রাধান্যে রচিত 'হুইট ফিল্ড উইথ রাভেন্স' (১৮৯০), 'দ্য সাওয়ার' (১৮৮৮), 'ল্যান্ডস্কেপ ইউথ স্নো' (১৮৮৮)

প্রভৃতি ছবির চিত্রকল্প মনে পড়ে। শস্যক্ষেত্রের রূপকর্মগুলো মানুষের তৈরি হলেও কোথায় যেন অদৃশ্য অরণ্যের প্রত্যক্ষ আভাস আছে। অরণ্যময় প্রকৃতি কখনও কখনও শিল্পীদের উদ্দীপ্ত করেছে অভিনব সৃজনকর্মে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্যারিসে জন্মগ্রহণ করা পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী পল গোগ্যাঁর (১৮৪৮-১৯০৩) জন্ম। তাঁর শিল্পচিন্তায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় টাহিটি দ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পর। শিল্পীর নিজের কথায়, "I have decided on Tahiti... and hope to cultivate my art there in the wild and primitive state." বস্তুত এই টাহিটি দ্বীপে গোগ্যাঁ দ্বীপবাসীদের একজন হয়ে নতুন বর্ণে, ফর্মে আলো আঁধারিতে যে সব ছবি এঁকে গেছেন তা শিল্পভান্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। এ বিষয়ে আর এক জার্মান রোমান্টিক শিল্পী ডেভিড ফ্রেডরিক (১৭৭৪-১৮৪০) এর ছবির কথা মনে পড়ে। যাঁর বেশ কিছু চিত্রমালায় ফুটে উঠেছে চাঁদের স্তিমিত স্নিগ্ধ আলোয় বরফাবৃত পাহাড়, পত্রপুষ্পহীন গাছপালা, জলাশয় প্রভৃতি। 'মর্নিং ইন দ্য রিসেনব্রীজ (১৮১০-১১), 'স্পিরিচুয়াল ইমেজারি' (১৮২৯), ভিলেজ ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মর্নিং লাইট' (১৮২২), 'মুন রাইজ ওভার দ্য সী' (১৮২২) প্রভৃতি শিল্পীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির নাম। তবে যাই আঁকা হোক না কেন, তার ভাবে গভীর উৎসর্জন এবং প্রবল অনুরক্তির প্রগাঢ় প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে আমি হাতে গোনা কয়েকজন পাশ্চাত্য শিল্পীর কথা বলেছি।

ভারতীয় চিত্রকলায় অরণ্য এবং প্রকৃতি এসেছে যুগে যুগে, কালে কালে বিচিত্র রূপে রসে। ভিত্তি চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত অজন্তা গুহাচিত্র প্রায় সহস্রাব্দীর পর লোক চক্ষুর সম্মুখে আসে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। অরণ্যময় পাহাড়ে শিবির স্থাপন করা একদল দুঃসাহসী ইংরেজ সৈন্যের অদম্য কৌতূহলের বশে সভ্য জগতের কাছে অজন্তা গুহার অপরূপ চিত্রাবলী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ সাত আটশ বছর ধরে গড়ে ওঠা অজন্তার ছবিগুলো সব জাতকের কাহিনী অবলম্বনে এ কথা প্রায় সবারই জানা। বিভিন্ন গুহায় আঁকা এই অনুপম চিত্রমালায় অরণ্যের উপস্থিতি খুবই কম। 'মহাকপি জাতক' এবং আরও দু-একটি ছবি চিত্রিত হয়েছে অরণ্যের পরিবেশে।

ভারতীয় চিত্রকলায় অরণ্য বা প্রকৃতি এসেছে মূল বিষয়ের পারিপার্শ্বিক হিসেবে। মধ্যযুগে মোঘল, রাজপুত, পাহাড়ী থেকে শুরু করে বিভিন্ন আঞ্চলিক কলমে ছোট আয়তনের যে অপূর্ব সব ছবি আঁকা হয়েছে তা এককথায় 'ইন্ডিয়ান মিনিয়েচার পেইন্টিং' নামে জগৎ বিখ্যাত। এইসব চিত্রমালায় অরণ্য বা প্রকৃতি আঁকা হয়েছে নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটকে বোঝাতে। যেমন রাজার নৌকা বিহার, বনে জঙ্গলে সুলতানের শিকার, রাধাকৃষ্ণের লীলা, রসমঞ্জুরী, যুদ্ধবিগ্রহ, রাগমালা প্রভৃতি।

ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে থাকে আধুনিক

ভারতীয় চিত্রকলায়। রাজা রবিবর্মার (১৮৪৮-১৯০৬) কয়েকটি চিত্রকল্পে মূল বিষয়ের পশ্চাৎপট হিসেবে নিসর্গ এসেছে। এ প্রসঙ্গে 'মৎসগন্ধী', 'লেডি ইন মুনলাইট', 'রিটার্নিং ফরম দ্য টাঙ্ক' ইত্যাদি ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্যদিকে অবয়বিক ছবির পাশাপাশি পরিপূর্ণ নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১) গগনেন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৩৮)। এরপর রামকিঙ্কর (১৯০৬-১৯৮০), বিনোদবিহারী মুখার্জী (১৯০৪-১৯৮০) এবং আরও কয়েকজন শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে পুরোপুরি প্রকৃতি-নির্ভর ছবি আঁকলেও ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়কেন্দ্রিক চিত্র রচনা করেছেন গোপাল ঘোষ (১৯১৩-১৯৮০)। তাঁর রূপরাজ্যে শোভা পাচ্ছে বন জঙ্গল, গাছগাছালি, ফুল, পাখী আরও কত কী! তিনি প্রকৃতিকে চর্মচক্ষে যা দেখেছেন তা আঁকেননি। দেখার অনুভূতিকে এঁকেছেন। ফলে তাঁর ছবি বাস্তবের অনুকৃতি নয়। বলাইবাহুল্য নিসর্গ চিত্রের ইতিহাসে গোপাল ঘোষ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন গোপাল ঘোষ এবং সুভো ঠাকুর (১৯১২-১৯৮৫)। নানা গুণের অধিকারী সুভো ঠাকুর সরাসরি প্রকৃতির ছবি না আঁকলেও তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে মানুষের দেহাবয়ব এঁকেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর আর এক সহযোগী এবং উল্লিখিত গ্রুপের সংস্থাপক সদস্য প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সুভোর যা কিছু অল্প ছবি আমি দেখেছি তাতে আমার মনে হয় ও আলংকারিক মোটিফের খুব পক্ষপাতী ছিল। মানুষের ফিগারকে সুভো কখনও চোখ দিয়ে দেখেনি, দেখেছে কাল্পনিক লতা-পাতার একানো-বাঁকানো ছন্দের লালিত্যে, বনানীর সজীব প্রকাশভঙ্গিতে। মানুষ সেখানে ঐ বনানীর একটি অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।" (স্মৃতিকথা সিল্পকথা: প্রদোষ দাশগুপ্ত, ১৯৮৬)

ধারাবাহিকভাবে পুরোপুরি প্রকৃতি চিত্রনের ক্ষেত্রে অন্যতম কয়েকজন শিল্পী হলেন ইন্দ্র দুগার (১৯৮৮-১৯৮৯), সত্যেন ঘোষাল (১৯২১-২০০৬), বি আর পানেসর (১৯২৭-২০১৪), পরমজিৎ সিং (১৯৩৫), বাদল পাল (১৯৩৭), শ্যামশ্রী বসু (১৯৩৮), গণেশ হালুই (১৯৩৬), অনিতা রায়চৌধুরী (১৯৩৮), রামলালধর (১৯৫৩-২০১০), সোহিনী ধর (১৯৬৩), মলয চন্দ সাহা (১৯৬১) প্রমুখ আরও কয়েকজন। এঁরা প্রত্যেকেই রাপকল্পনায় স্বতন্ত্র ও মৌলিক, ভাবে, রূপে রঙে ও সংবেদনশীলতায়। বন বনান্তর ও নৈসর্গিক চিত্র রচনার একটা ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে সমকালীন শিল্পচর্চায়। আনন্দের কথা এই ধরনের ছবির সমজদার এবং ক্রেতা ক্রমশই বাড়ছে। আশঅ করা যায় এইভাবেই মানুষের মধ্যে অরণ্য সংরক্ষণ সচেতনতা বাড়বে।